International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-VI, November 2023, Page No.106-114
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.106-114

পশুর বিচার-বুদ্ধি প্রসঙ্গে রেনে দেকার্ত: একটি বিচারমূলক বিশ্লেষণ

ড. উৎসব রায়

সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The right of a living being to protect its own life means recognizing the right to life of other animals. Therefore, respecting the rights of animals should be one of the duties of humans. But in order to get this right of animal, many people think that the presence of animal's reasons or intellect is one of the necessary conditions. Most Western thinkers also believe that only human beings can have moral dignity. The moral status of non-humans (animals, plants etc.) has been neglected in the west for centuries. They think only humans have reason. Otherwise, most western thinkers have denied the possibility of reason in non-humans. One of them is René Descartes. Descartes provides many arguments in favour of those only human beings have reason. He believed that intelligence was created by God only for humans. In this article I have tried to understand logically whether animals have reason or not. In my opinion, the presence or absence of intellect cannot be an obstacle to an animal being a superior being and getting any rights. Reason or intellect cannot be the only condition for obtaining rights. Animal killing and human cruelty to animals is never morally acceptable on the grounds that animals do not have rationality. Moreover, there are many philosophers in the West who have accepted the possibility of animal's intellect.

Keywords: Intellect, Thinking, Animal right, Moral dignity, Superiority.

যে ব্যক্তিমানুষের সমষ্টি নিয়ে বৃহত্তর জনসমাজ গঠিত হয়, নীতি-নৈতিকতাও তারই প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। এই বৃহত্তর জনসমাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি মানুষের বেশ কিছু নৈতিক দাবি থাকে যা সাধারণভাবে অধিকার বলে উল্লেখিত হয়ে থাকে। একই সাথে এই ব্যক্তি সমষ্টি কেন্দ্রিক সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান থাকে নৈতিক কর্তব্য। জনসমাজের কল্যাণের প্রশ্নে মানুষের প্রতি নির্দেশিত ও তাদের দ্বারাই নির্ণীত কিছু বাধ্যবাধকতাকেই সাধারণত কর্তব্য বলা হয়ে থাকে। একই সাথে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র মানুষের সমাজের পরিসরে নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য অধিকার অপরিহার্যতা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই অধিকার যেমন জনসমাজ কর্তৃক নির্দিষ্ট ঠিক একইভাবে তা জনসমাজ দ্বারাই রক্ষিত হয়ে থাকে, অর্থাৎ সমাজ যেমন সমাজের অনুসারে ব্যক্তি মানুষের কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দেয় এবং অধিকারের মর্যাদা দেয় ঠিক তেমনি ভাবেই এই জনসমাজের উপরেই তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত। ঠিক সেই কারণেই একজন সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কখনো সামাজিক অধিকার দাবি করতে পারে না। যে অধিকারের সূতিকাগার ও

পালনক্ষেত্র সমাজ, তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষ তারই ফসল কখনোই দাবি করতে পারে না। এই অধিকার গুলি একদিকে যেমন ব্যক্তি কল্যাণের উপায়, স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানুষের আত্ম উপলব্ধির সহায়ক, ঠিক তেমনভাবেই এটি সমাজ কল্যাণের দিকনির্দেশকও বটে। অধিকারবোধের প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কর্তব্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ে কারণ প্রত্যেকটি অধিকার কিছু কর্তব্যের সংকেত বহন করে। সমাজের প্রেক্ষিতে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির যে অধিকার স্বীকৃত তার প্রতি অপরাপর ব্যক্তির শ্রদ্ধা প্রদর্শন একটি অপরিহার্য কর্তব্য, আবার সেই অধিকার যাতে সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে সেই দিকেও দৃষ্টিপাত করা প্রত্যেকটি সামাজিক মানুষের একান্ত কর্তব্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আইনগত কর্তব্য এবং নৈতিক কর্তব্যের মধ্যে একটি পার্থক্য বিদ্যমান। একটি রাষ্ট্র পরিকল্পিতভাবে একটি আইনগত কর্তব্য প্রত্যেকটি নাগরিকের উপর আরোপ করতে পারে কিন্তু নৈতিক কর্তব্য এমন আরোপিত হয় না, তা সমাজের পরিসরেই গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটি সামাজিক মানুষের মনে বর্ধিত হয়। এই কর্তব্য সমাজের অনুমোদন সাপেক্ষ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে - যে সম্পত্তির অধিকার সমাজ ব্যক্তিকে দিয়েছে। অন্যদিকে অধিকারভোগী ব্যক্তির কর্তব্য সমাজ কল্যাণের স্বার্থে সেই অধিকার প্রয়োগ করা। অর্থাৎ ব্যক্তির আত্ম উপলব্ধির জন্যেই তার অধিকার প্রদত্ত। বাঁচার অধিকার যেমন মানুষের একটি মৌলিক অধিকার রূপে স্বীকৃত তার কারণ মানুষের লক্ষ্য যদি আত্ম উপলব্ধি হয় তবে তার বেঁচে থাকার প্রয়োজন অপরিহার্য। জীবনকে যাপনের মধ্যে দিয়েই মানুষ তার জীবনের বৈচিত্র্যময় সম্ভাবনাকে বিকশিত করে। তাই মানুষ শুধু নিজেকে নয় তার পরিপার্শ্বের অপরাপর ও পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবের বেঁচে থাকার অধিকারকে মান্যতা দেয়। দেখা যায়, যে পশুরা আত্মসর্বস্ব জীবনযাপনে মগ্ন এবং যাদের চিত্ত বিশ্ব কল্যাণের চিন্তারহিত তারা মানুষ বলে বিবেচিত হয়নি, সুতরাং আত্ম সর্বস্বতার উর্দ্ধে উঠে বিশ্ব কল্যাণের ক্ষেত্রে যারা আত্মনিয়োগ করেছে তারাই বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, এবং এই চিন্তা ধারাই মানুষকে অন্যান্য পশুদের থেকে পৃথক করে স্বাতন্ত্র দান করেছে। কোনো জীবের নিজের জীবন রক্ষার অধিকারের অর্থই হলো অপরাপর প্রাণীর জীবনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া। তাই পশুর অধিকারকে মান্যতা দেওয়া মানুষের অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু পশুর এই অধিকারকে মান্যতা পেতে হলে পশুর বিচার-বুদ্ধি থাকা অন্যতম আবশ্যিক শর্ত বলে অনেকে মনে করেন।

নীতিবিদ্যায় অন্তর্ভুক্তি: পশুর বিচার-বুদ্ধি বিষয়ক আলোচনা-সূত্রে প্রথমেই এই প্রসঙ্গ অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে আমি এখানে 'পশু' শব্দের দ্বারা কাদেরকে নির্দেশিত করছি, সাধারণত মনুষ্যেতর প্রাণীদেরকেই আমরা 'পশু' হিসাবে উল্লেখ করে থাকি। অর্থাৎ জড় জগৎ, উদ্ভিদ ও মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রাণীকেই 'পশু' বলে অভিহিত করে এই আলোচনার উত্থাপন করা হ'লো। পশুদের বিচার-বুদ্ধি আছে কিনা তা যুক্তি দ্বারা বোঝার চেষ্টা করা বা বিচার-বুদ্ধি থাকা বা না-থাকার সঙ্গে অধিকার থাকার সম্পর্ক বোঝা এবং এই প্রসঙ্গে দেকার্তের অভিমতের বিচারমূলক বিশ্লেষণই আমার এই প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু। প্রকৃতপক্ষে যে কার্যের প্রতিফল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে না সেগুলি নীতিবিদ্যার অন্তর্গত বিষয়ে হিসাবে স্বীকৃতি পায় না। সহজভাবে বলতে গেলে যে কাজের প্রভাব সমাজের ব্যাপ্ত পরিসরে বিস্তৃত হয় সেই কাজগুলি নীতিবিদ্যার অধীন। একটি কাজের দ্বারা সমাজ কিভাবে প্রভাবিত হবে তা সর্বদাই পরিস্থিতি নির্ভর। যখন মানুষের কোন কাজের দ্বারা পশুজগত প্রভাবিত হয় তা স্বাভাবিকভাবেই নীতিবিদ্যার আলোচনা-বৃত্তের অধীন হয়ে পড়ে।

পশুর প্রতি মানুষের আচরণকে নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা এই বিষয় নিয়ে পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে মতানৈক্য বর্তমান। তাঁদের অনেকেরই বিবেচনা অনুযায়ী পশুরা নৈতিক দায়বদ্ধতারহিত একটি যন্ত্র স্বরূপ মাত্র। দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম এই মতামতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলেন যে পশুরা কখনোই একটি যন্ত্র স্বরূপ মাত্র নয়, মানুষের যেমন সুখ দুঃখের অনুভূতি বর্তমান অনুরূপভাবে পশুদের মধ্যেও এই একই রকম সুখ দুঃখের অনুভূতি দেখা যায়। মানুষ মানুষের দ্বারা নির্যাতিত হলে তা যেমন নৈতিকভাবে অনুচিত বলে বিবেচিত হয় তেমনি একই যুক্তিতে পশুদের বিষয়টিও মননশীল আলোচনার দাবি রাখে। বেন্থামের অভিমত অনুযায়ী মানুষের যদি যন্ত্রনা না পাওয়ার অধিকার থেকে থাকে তবে অনুরূপভাবে পশুদেরও মানুষের দ্বারা নির্যাতিত না হওয়ার ও যন্ত্রণা না পাওয়ার অধিকার থাকা উচিত। অর্থাৎ মানুষকে এমন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত, যা পশুদের জীবনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে সক্ষম। মানুষের দ্বারা পশুদের যদি যন্ত্রণা না পাওয়ার অধিকার থেকে থাকে তবে তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটিও কখনোই অস্বীকৃত হতে পারে না।[1] সেক্ষেত্রে মানুষ নিজের স্বার্থ চরিতার্থতার ক্ষেত্রে যদি পশু হত্যাকে একটি স্বাভাবিক নৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে, তবে তাদের এটি একটি ভ্রান্তি। সুতরাং পশু হত্যাও একটি নৈতিকতার প্রেক্ষাপটে অনুচিত কাজ। Animal ethics এর বক্তব্যই হলো যদি পশুরা মানুষদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের শিকার হয় তবে তা নৈতিকতা বিরোধী। পশুর অধিকার মতবাদে বিশ্বাসী দার্শনিকগণ সর্বদাই তাদের বেঁচে থাকার অধিকার এবং যন্ত্রণা না পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি জানিয়ে আসছেন। অধিকার যেক'টি অর্জনের বিষয় এ কথা সর্বোচ্চভাবে সত্য হলেও পশুদের ক্ষেত্রে এ-কথা কখনোই প্রযোজ্য হতে পারে না কারণ মানুষ তার অধিকারের কথা যার মাধ্যমে ব্যক্ত করে অর্থাৎ ভাব বিনিময়ের মাধ্যম যে ভাষা, পশুদের ক্ষেত্রে সেই ভাষার হয়তো অস্তিত্ব আছে কিন্তু তা মানুষের বোধগম্যতার অতীত, অর্থাৎ পশুদের সঙ্গে মানুষের ভাব বিনিময়ের বিষয়টি এখনো পর্যন্ত বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তাই মতামতের বিনিময় বিষয়টি অসম্ভবই রয়ে গেছে। তবে পশুদের জৈবিক প্রবৃত্তি গুলি এটাই সর্বদা প্রমাণ করে যে তাদের মধ্যে বাঁচার প্রেরণা রয়েছে। বাসা বানানো থেকে সন্তান প্রতিপালন তাদের এই জীবন ইচ্ছারই প্রতিফলন। যদিও দেকার্ত মনে করেন, মানুষই কেবল উন্নত জীব, কারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে।

দেকার্তের মতে পশুর বিচারবুদ্ধির অস্বীকৃতি: মানুষেরই কেবল নৈতিক মর্যাদা থাকতে পারে বলে পাশ্চাত্যের বেশীরভাগ চিন্তাবিদ্ মনে করেন। না-মানুষের (মনুষ্যেতর প্রাণী, উদ্ভিদকূল প্রভৃতি) নৈতিক মর্যাদাকে বহু যুগ পূর্ব থেকে পাশ্চাত্যে অবহেলা করা হয়। বিচারবুদ্ধি (reason) কেবল এবং কেবলমাত্র মানুষেরই আছে। পশুর বিচারবুদ্ধি থাকার সম্ভাবনাকে বেশিরভাগ পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ অস্বীকার করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম হলেন রেনে দেকার্ত। বিজ্ঞানের আলোয় দর্শনকে সুনিশ্চিত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস আধুনিক যুগের দর্শনে দেখতে পাওয়া যায়। এর অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০), রাসেল রেনে দেকার্তকে আধুনিক দর্শনের জনক হিসাবে অভিহিত করেন। জগতের অধিসত্তা অনুসন্ধানের প্রয়াস দর্শনের সূচনাকাল থেকেই দার্শনিকরা করে আসছেন। তবে বিভিন্ন দার্শনিক এই সম্পর্কে বিভিন্ন

[1] Kniess, Johannes. (2018). Bentham on animal welfare. *British Journal for the History of Philosophy*. Vol- 27(3). Pg- 1-17.

মনোভাব পোষণ করেন। রেনে দেকার্ত অধিসত্তা বিষয়ক আলোচনায় 'দ্রব্য' (substance) শব্দটি উল্লেখ করেন। দ্রব্যের প্রসঙ্গে দেকার্ত মনে করেন, দ্রব্য হলো এমন কিছু যা তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কিছুর ওপর নির্ভরশীল নয়[2] এবং দ্রব্যের ধারণাকে বোঝার জন্য অন্য কোনো ধারণার সাহায্য নিতে হয় না। ডেকার্ত তিন প্রকার দ্রব্য স্বীকার করেন।[3] যথা- ঈশ্বর (God), দেহ (Body) ও মন (Mind), ঈশ্বর হলেন নিরপেক্ষ দ্রব্য এবং দেহ ও মন হল ঈশ্বর সাপেক্ষ দ্রব্য। যদিও তিনি দ্রব্য বলতে বোঝান, যা তার অস্তিত্বের জন্য কারও ওপর নির্ভরশীল নয়, সেই দিক থেকে দেখলে দেহ ও মনকে দ্রব্য বলা যায় না, কারণ তারা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। সেই অর্থে ঈশ্বরকেই একমাত্র দ্রব্য বলে অভিহিত করা যায়। দ্রব্য সংক্রান্ত আলোচনায় এক পর্যায়ে ডেকার্ত গুণ (Attribute) ও প্রত্যংশ (Modes) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, দ্রব্যের আবশ্যিকধর্ম বা বৈশিষ্ট্য, যা আবশ্যিকভাবে দ্রব্যের মধ্যে নিহিত থাকে, তাকে গুণ বলে। অন্যদিকে দ্রব্যের পরিবর্তনশীল গৌণ বৈশিষ্ট্যকে বলে প্রত্যংশ। দেহ বা জড় দ্রব্যের আবশ্যিক ধর্ম বা গুণ হল বিস্তৃতি (Extension)। আবার মন নামক দ্রব্যের অপরিহার্য বা আকস্মিক বৈশিষ্ট্য হলো চিন্তন বা চেতনা (Thought or thinking)। তিনি দেহ ও মনকে পৃথক সত্তা বলে চিহ্নিত করেন। তবে এই দুটি সত্তা মানুষের মধ্যে মিলিত হয় এক জটিল সামঞ্জস্য নিয়ে, দেহ তার অস্তিত্বের জন্য মনের ওপর এবং মন তার অস্তিত্বের জন্য দেহের উপর নির্ভরশীল নয়। তবে এই দুটি দ্রব্য (দেহ ও মন) পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে বলে ডেকার্ত মনে করেন। মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক ঘটনার সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। ডেকার্ত মনে করেন, ঈশ্বর দেহ ও মনকে সৃষ্টি করেছেন। দেহ (Matter) ও মন (Mind) তাদের অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। দেহ ও মন প্রকৃতিতে অবস্থান করে এবং মানুষের মধ্যে দেহ ও মনের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। বাহ্যবস্তু বা অন্যান্য দেহধারী উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহের মতো মানুষের দেহ আছে। সকল দেহের গুণ হল বিস্তৃতি (extension)। তাই মানুষের দেহেও বিস্তৃতি নামক মুখ্য বৈশিষ্ট্য বা গুণ বর্তমান। দেকার্ত মনে করেন, সকল বিস্তৃতিসম্পন্ন দেহ যান্ত্রিক নিয়মে চলে এবং দেহগুলির প্রত্যেকটি হল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র (Automata or moving machines)।

দেহ কি যন্ত্র?: জড় বা দেহের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি যন্ত্রের সঙ্গে দেহের তুলনা করেন। অর্থাৎ জড় বা দেহের ব্যাখ্যায় তিনি হলেন যান্ত্রিকতাবাদী। তিনি দুই ধরনের যান্ত্রিকতার কথা বলেন। যথা- কৃত্রিম যান্ত্রিকতা এবং প্রাকৃতিক যান্ত্রিকতা। বিষয়টি একটু ভেঙে বললে এরকম দাঁড়ায় মানুষ যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরি করে তাকে কৃত্রিম যান্ত্রিকতার দ্বারা অভিহিত করা যায়। অন্যদিকে প্রকৃতিতে বিদ্যমান দেহগুলি হলো প্রাকৃতিক যান্ত্রিকতার উদাহরণ। অনেকেই মনে করেন মানুষ বা অন্য দেহগুলি ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। তাই তুলনামূলক আলোচনায় দেকার্ত বলেন, মানুষের সৃষ্ট কৃত্রিম যন্ত্রগুলি থেকে ঈশ্বরের সৃষ্টি করা দেহগুলি অধিকতর জটিল ও উন্নত। ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্ট যন্ত্র সর্বাপেক্ষা উন্নততর হবেই। ঈশ্বরের সৃষ্টি করা প্রকৃতি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র হিসাবে আমরা উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের উল্লেখ করতে পারি। দেকার্ত মনে

[2] An existent thing which requires nothing but itself in order to exist.

[3] Russell, Bertrand. (1945). *A History of Western Philosophy*. New York: Simon and Schuster. Pg- 564.

করেন, এদের মধ্যে মানবদেহ সবচেয়ে জটিল সংগঠন এবং এটি সর্বাপেক্ষা উন্নত, যদিও মানবদেহও যান্ত্রিক নিয়মে চলে।

কিন্তু মানুষের মধ্যে দেহ ছাড়া মনের সমন্বয় দেখা যায়। এই মনের (Mind) আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ হলো চিন্তা করা (Thought / Thinking)। এছাড়া দেকার্ত Discourse on Method-এর পঞ্চম অংশে বলেছেন, আত্মার প্রকৃতি হলো চিন্তা করা।[4] দেকার্ত তাই মন বা আত্মার কার্যাবলীকে শরীরের বা দেহের কার্যাবলী থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক বলেছেন। যদিও এই চিন্তনক্ষমতা বা বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগর ক্ষমতা (Reason) মানুষ ছাড়া না-মানুষের বা পশুর থাকতে পারে না বলে দেকার্ত মনে করেন। দেহ ও মনের সারধর্ম ও কার্যাবলী ভিন্ন হলেও দেহ ও মন পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে বলে দেকার্ত মনে করেন। মনের চিন্তা-চেতনা ভালোলাগা-মন্দলাগা দ্বারা দেহ প্রভাবিত হয়, আবার দেহের অবস্থান দ্বারাও মন প্রভাবিত হয়। যেমন শরীর খারাপ হলে মনও খারাপ লাগে। যাই হোক আমার প্রবন্ধের প্রেক্ষাপটে আলোচনার বিষয়বস্তু হল, মানুষের কি কেবল বিচারবুদ্ধি আছে? বা ডেকার্ত কি মনে করেন, বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা (rational) একমাত্র মানুষের আছে? -নিম্নে এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো।

বিচারবুদ্ধি একমাত্র মানুষের আছে: দেকার্তের যুক্তি: দেকার্ত আত্মার বা মনের আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ হিসাবে 'চিন্তা করা'কে (to think) বুঝিয়েছেন। এই বৈশিষ্ট্য (চিন্তা করা) যাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরকেই উন্নত জীব বা মানুষের অনুরূপ বলা যেতে পারে বলে দেকার্ত মনে করেন। কিন্তু দেকার্ত যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে বিচারবুদ্ধি বা চিন্তনক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। উদ্ভিদ বা মনুষ্যেতর প্রাণীর (না-মানুষ) বিচার-বুদ্ধি বা চিন্তন ক্ষমতা বলে বাস্তবিকপক্ষে কিছু নেই। অতএব মানুষ না-মানুষ বা পশু অপেক্ষা উন্নততর জীব। এই প্রসঙ্গে দেকার্তকে অনুসরণ করে নিম্নে কিছু যুক্তির অবতারণা করা হল-

প্রথমত: মানুষ শব্দ বা সংকেতের মাধ্যমে অন্যের কাছে তার মনের ভাব বা চিন্তা তুলে ধরে। কিন্তু পশুরা শব্দ বা যথার্থ কোন সংকেতের ব্যবহার করতে পারে না। কিন্তু আমরা তো এমন যন্ত্রের (machine) কল্পনা করতে পারি, যা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। তাছাড়া শব্দ উচ্চারণ তো সম্পূর্ণভাবে দৈহিক বিষয়, ইন্দ্রিয়ের কর্ম বা শারীরিক কর্ম বলা যেতে পারে, অতএব প্রশ্ন হলো, শব্দের ব্যবহার কি চিন্তার অনুমাপক হতে পারে? এর উত্তরে দেকার্তকে অনুসরন করে বলা যায়, শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেই তা চিন্তার প্রকাশ করে না একথা যেমন সত্য, তেমনি একই শব্দের ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন অর্থ হতে পারে এবং তা কেবল বিচার-বুদ্ধি বা চিন্তন ক্ষমতা দ্বারাই বোঝা যায় বা প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ প্রশ্ন অনুসারে, সঠিক শব্দ চয়ন করে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে মনের ভাবকে সঠিকভাবে শব্দ বা সংকেতের মাধ্যমে একমাত্র মানুষই প্রকাশ করতে পারে। যেমন স্পর্শ অনেক ধরনের হতে পারে এবং স্পর্শ অনুসারে অন্যরা কি বলতে চাইছে তা প্রকাশিত হয়। সেই কারণে কোনো স্পর্শ সুখের অভিব্যক্তিব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করায় এবং কোনো স্পর্শ পেয়ে মানুষ চিৎকার করে ওঠে এবং বলে ওঠে 'সে ব্যথা পেয়েছে' প্রভৃতি। কিন্তু কোন যন্ত্র (যা শব্দ উচ্চারন করতে পারে) ভিন্ন অনুভূতিতে ভিন্ন-ভিন্ন শব্দের ব্যবহার করতে অক্ষম। যদিও কোন নির্বোধ মানুষও তা বোঝাতে সমর্থ্য।

[4] Descartes, Rene. (2006). *A Discourse on the Method*. Maclean, Ian (Trans.). New York: Oxford University Press. Ch- 5.

দ্বিতীয়ত: অনেক সময় দেখা যায় মানুষ ছাড়া বিভিন্ন দেহধারী যন্ত্র (পশু-পাখি) এমন অনেক কাজ করতে পারে যা মানুষ করতে সক্ষম। হয়তো বা মানুষের থেকে ভালোভাবে তারা কোন কাজ সম্পাদন করছে, এর থেকে কি এসব না-মানুষদের (যন্ত্র) চিন্তনক্ষমতা নেই- একথা বলা যায়? এর উত্তরে ডেকার্ত বলেন, এইসব না-মানুষেরা বিভিন্ন ধরনের কাজই পারদর্শীতার সাথে কখনো হয়তো করছে। কিন্তু অন্য কোন সাধারণ কাজ হয়তো করতে তারা ব্যর্থ হবে বা সেই কাজ করতে অনেকের মতো তারা অবশ্যই সমর্থ হবে না। কিন্তু তা প্রমাণ করে এইসব না-মানুষরা এসব কাজ করে তাদের ইন্দ্রিয়ের প্রবণতা অনুসারে; কখনই বোঝা (understanding) বা চিন্তার (thinking) সাহায্যে তারা কাজটি করেনি। বিচার-বুদ্ধি একটি সার্বিক বিষয়, যা মানুষ যে কোনো পরিস্থিতিতে যেকোন কাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে, কিন্তু বিভিন্ন মনুষ্যেতর প্রাণী বা না-মানুষরা তা করতে পারে না। না-মানুষদের কোন বিশেষ স্বভাব দ্বারা চালিত হতে হয় বা প্রবণতা (disposition) প্রয়োজন হয় কোন বিশেষ কাজ করার জন্য, কিন্তু কোন দেহরূপী যন্ত্রে এত ইন্দ্রিয় থাকেনা, যা প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য পৃথক-পৃথক প্রবণতা সরবরাহ করবে। মানুষ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সঠিকভাবে বিভিন্ন কাজ করতে সক্ষম, কারণ বিচার-বুদ্ধি বা চিন্তা কেবল মানুষেরই আছে। এই যুক্তি প্রমাণ করে মানুষ পশুদের (না-মানুষ) থেকে পৃথক ও উন্নত যন্ত্র।

তৃতীয়ত: অনেক নির্বোধ ব্যক্তি, এমন কী পাগলও নিজের চিন্তাকে বা মনের ভাবকে প্রকাশ করতে সক্ষম। তারা হয়তো বিভিন্ন শব্দকে একসঙ্গে সাজিয়ে বাক্য গঠন করে বলতে পারেনা, তথাপিও তাদের চিন্তাকে আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য কোনো পশু; সেই প্রাণী যতই নিখুঁতভাবে তার কাজ করতে পারুক না কেন বা তাকে যতই শেখানো হোক না কেন সেই পশু কখনই তাদের চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারবে না। এর কারণ শুধুমাত্র এই নয় যে, সেসব পশুদের (না-মানুষ) কথা বলার ইন্দ্রিয় (organs of speech) আছে; এটির একমাত্র কারণ হল এইসব প্রানীদের বিচার-বুদ্ধি নেই। যদি তা না হতো তবে অনেক টিয়া বা তোতাপাখি তো মানুষের মতো কথা বলতে পারে, কিন্তু তাদের এই কথা বলাটা কখনোই তাদের চিন্তা বা বিচারবুদ্ধির প্রকাশক নয় বলে দেকার্ত মনে করেন। অন্যদিকে একজন মানুষ মূক (dump) বা বধির (deaf) হলেও ধ্বনি-যন্ত্রে অর্থাৎ কথা বলার ইন্দ্রিয়ে (organ of speech) তার সমস্যা থাকলেও সে নিজের মতো করে সংকেত বানিয়ে বা অন্য কোনোভাবে যাদের সাথে সে আছে তাদের কাছে নিজের চিন্তা বা মনের ভাবকে ঠিকমত প্রকাশ করতে পারে। অন্য মানুষ চাইলে এইসব মূক-বধিরদের ভাষা শিখে তাদের সঙ্গে কথা বলতেই পারে। এই যুক্তি প্রমাণ করে, কথা বলতে সক্ষম হওয়াটা কখনই বিচারবুদ্ধি থাকাকে প্রমাণ করে না। আরও বলা য়ায়, কথা বলতে গেলে সেই অর্থে বিচার-বুদ্ধি থাকার দরকার হয় না। তাছাড়া এই যুক্তি দ্বারা দেকার্ত ইহাও প্রমাণ করেন যে, মানুষের থেকে পশুদের কম বুদ্ধি আছে তাই নয়, পশুদের কোনো বিচার-বুদ্ধিই নেই (And that proves not only that the brutes have less reason than man, but that they have none at all)।

চতুর্থত: অনেকে মনে করতে পারেন, একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির জন্তুদের মধ্যে কিছু জন্তু এমন থাকতে পারে যাদের মানুষের সাথে তাদের তুলনা চলে। যুক্তি দিয়ে তারা হয়তো বলবেন এইসব উন্নত জন্তুদের খুব সহজেই প্রশিক্ষিত করা যায় অন্যান্য জন্তুদের তুলনায়, তাই এইসব জন্তুদের বিচার-বুদ্ধি আছে এমন ভাবতে সমস্যা কি? দেকার্ত এই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, তাহলে এমন কিছু জীব-জন্তু আছে ধরে নেওয়া যাক, যারা অন্যান্য জীব-জন্তুদের তুলনায় উন্নততর বা সমর্থ্য সম্পন্ন (So we have the notion of beasts that are abler or superior to their fellows)। এখন স্পষ্টতই কথা বলার ক্ষমতার

ক্ষেত্রে খুব বেশি বিচার-বুদ্ধির নিশ্চিত ভাবেই প্রয়োজন হয় না। সুতরাং দেকার্ত মনে করেন কোন প্রাণীর যদি বিচার-বুদ্ধি থাকে তবে আমরা আশা করতে পারি উচ্চতর প্রজাতির একটি বানর বা উচ্চতর প্রজাতির একটি তোতা পাখি (high grades monkeys or parrots) অন্তত তেমন হবেই। তাই আমরা আশা করতে পারি, যেহেতু কথা বলার জন্য খুব বেশি বিষয়বুদ্ধির যেহেতু প্রয়োজন হয় না, সেহেতু উচ্চতর প্রজাতির একটি বানর বা তোতাপাখি অন্তত পক্ষে একটি নির্বোধ শিশুর (Stupid child) মতো বা মাথার সমস্যা আছে এমন একজন মানসিকভাবে অসুস্থ শিশুর (A child with a defected brain) মতো অন্তত কথা বলতে পারবে। কিন্তু কোন উচ্চতর প্রজাতির বানর বা তোতা পাখি বা অন্য কোনো পশু সেটুকু কথাও বলতে পারবে না। এর দ্বারা দেকার্ত প্রমাণ করেন, পশুর আত্মা মানুষের আত্মা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষের আত্মার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য বা গুণ হল চিন্তন (বিচার-বুদ্ধি)। কিন্তু পশুর এই বিচারবুদ্ধির কোন ক্ষমতা নেই।

পঞ্চমত: বিশেষত প্রাচীনকালে বা আজও অনেকে মনে করেন যে, পশু-পাখিদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে যা আমাদের অর্থাৎ মানুষের বোধগম্য হবে না। যদিও তাদের প্রজাতির অন্য পশুরা সেই ভাষা বুঝতে পারে। কিন্তু দেকার্ত এ-কথা মানেন না যে পশু পাখিদের নিজস্ব একটি ভাষা আছে, কিন্তু সেই ভাষা মানুষ বুঝতে অক্ষম। দেকার্ত যুক্তি দিয়ে বলেন, এমন অনেক পশু-পাখি আছে তারা হয়তো ক্ষেত্রবিশেষে খুবই নিখুঁতভাবে কোন কাজ করেছে বা করতে সক্ষম। কিন্তু এর দ্বারা প্রমাণিত হয় কি পশু-পাখিদের বিচারবুদ্ধি (reason) আছে? ডেকার্ত মনে করেন কিছু পশু-পাখি কোন একটি কাজ দক্ষতার সাথে করলেও সমপ্রজাতির অন্যান্য পশুপাখিরা হয়তো সেই কাজ করতে সক্ষম হবে না। ডেকার্ত আরো বলেন সেই বিশেষ কাজ যা পশুপাখিরা করতে সক্ষম তা কখনোই একজন মানুষের থেকে বেশী ভালোভাবে বা দক্ষতা সহকারে তারা করতে পারে না। এইসব পশু-পাখি কোন একটি কাজ করে তাদের ইন্দ্রিয়ের প্রবণতা (disposition of their organ) থেকে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যেমনভাবে একটি ঘড়ি তার যন্ত্রগুলি দ্বারা অর্থাৎ চাকা, স্প্রিং প্রভৃতির দ্বারা যেমন একেবারে সঠিক ভাবে সময়ের পরিমাপ করতে সক্ষম, কিন্তু একজন বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সকল দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সে সময়ের পরিমাপ ঘড়ির মতো নিখুঁতভাবে করতে পারে না। অর্থাৎ এটার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একটি ঘড়ি তার যন্ত্রগুলির কাজের প্রবণতা দ্বারা মানুষের থেকেও নিখুঁতভাবে সময়ের পরিমাপ করতে পারে। একইভাবে যেসব পশু-পাখি দক্ষতা সহকারে কোন কাজ করছে, তারা সেই কাজ বিচার-বুদ্ধি থেকে করে না, বরং ইন্দ্রিয়ের প্রবণতা অনুসারেই সেই কাজ করে। এইভাবে দেকার্ত প্রমাণ করলেন পশুর কোনও মন (mind) নেই এবং তাদের বিচার-বুদ্ধিও (reason) নেই। দেকার্ত তার Discourse on Method পুস্তকের পঞ্চম অংশে বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং অন্তিমে দেখিয়েছেন মানুষের কেবল বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা ও চিন্তার ক্ষমতাযুক্ত মন আছে।[5]

আত্মার সঙ্গে বা মনের সঙ্গে দেহের সম্পর্ক ব্যাখা করতে গিয়ে দেকার্ত বলেন একজন জাহাজের নাবিকের সঙ্গে তার জাহাজের যেমন সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে তার আত্মা বা মনের সম্পর্ক তার থেকে অনেক বেশি গভীর। কারণ জাহাজের ক্ষতি হলে নাবিকের সরাসরি কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু মানুষের শরীরের ক্ষতি হলে তার দ্বারা মনও প্রভাবিত হয়। আবার মন ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার প্রভাব শরীরের উপর পড়ে। কারণ নাবিক

[5] Descartes, Rene. (2006). *A Discourse on the Method*. Maclean, Ian (Trans.). New York: Oxford University Press. Ch- 5.

যেমনভাবে জাহাজ চালনা করে, আত্মার সঙ্গে দেহের সম্পর্ক তেমন নয়। আত্মার বা মনের মধ্যে অনুভূতি এবং চাহিদা গুলি (ক্ষুধা-তৃষ্ণা) থাকে। এভাবে দেকার্ত দেহ ও মন মানুষের ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত থাকে ও তারা পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে বলে মনে করেন। উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে দেকার্ত মানুষের মধ্যে চেতন আত্মা বা বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন আত্মা (Rational Soul) স্বীকার করলেও তা পশুর মধ্যে নেই বলে মনে করেন। এই বুদ্ধিমত্তা ঈশ্বর কেবলমাত্র মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন বলে ডেকার্ত মনে করেন। কিন্তু দেকার্তের এই অভিমত সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। আমার মতে, বিচার-বুদ্ধি থাকা বা না থাকা পশুর উৎকৃষ্ট হওয়া এবং তার কোন প্রকার অধিকার প্রাপ্তির অন্তরায় হতে পারেনা।

বিচারবুদ্ধিই অধিকার প্রাপ্তির একমাত্র শর্ত নয়:

প্রথমত: মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সামান্য মনোযোগী দৃষ্টিপাত করলেই একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাদের কাছে একটি পশুর প্রাণের মূল্য মানুষের প্রাণের মূল্যের চেয়ে কখনোই অধিক হিসেবে বিবেচিত হয় না। মানুষের কাছে মানুষের প্রাণের মূল্য যেমন অধিক ঠিক তেমনি ভাবেই একটি পশুর কাছে তার জীবনের মূল্য অধিক, তবে মানুষ কোন অধিকারবোধে তাদের জীবন যাপনকে বিপর্যস্ত করতে পারে এবং তাদের হত্যা করতে পারে? এই মতামতের প্রত্যুত্তরে সাধারণত শোনা যায় মানুষের উৎকৃষ্টতার মানদণ্ড হলো বিচার-বুদ্ধি। যাদের মধ্যে বিচার-বুদ্ধি নেই তারা কখনো উৎকৃষ্ট হতে পারে না, এই ধারণা জন্ম থেকেই আমাদের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে। কিন্তু বিচার-বুদ্ধি থাকা বা না থাকা পশুর উৎকৃষ্ট হওয়া এবং তার কোন প্রকার অধিকার প্রাপ্তির অন্তরায় হতে পারেনা।

দ্বিতীয়ত: কোন কাজটি করা উচিত এবং কোনটি নয় এই বিচার বুদ্ধি যাদের মধ্যে অনুপস্থিত সাধারণত তাদের বুদ্ধি কম বলে মনে করা হয়। যেহেতু পশুদের নৈতিক বিচার-বুদ্ধি নেই সেহেতু তাদের অধিকার-দাবীও অর্থহীন, কিন্তু এটি একটি প্রশ্নাতীত অভিমত নয়। কারণ বিচারবুদ্ধিই যদি অধিকার প্রাপ্তির প্রাথমিক শর্ত হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে সদ্যজাত শিশুর ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সদ্যজাত মানবশিশুর অধিকার সমাজের পরিসরে স্বীকৃত। শিশুদের যেহেতু নৈতিক দায়বদ্ধতা ও বিচারবুদ্ধি নেই, সুতরাং দেকার্তের যুক্তি অনুসারে শিশুদেরও অধিকারের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুদের অধিকার সর্বদাই সমাজ স্বীকার করে। সুতরাং বিচারবুদ্ধিই অধিকার প্রাপ্তির একমাত্র শর্ত নয়, অর্থাৎ পশুরা যেহেতু বিচার বুদ্ধিহীন জীব সেহেতু তাদের অধিকার নেই- এমন কথা বলা যায় না।

তৃতীয়ত: যুক্তিগতভাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে যদি কোন কোন বিশেষ ক্ষমতাকে উত্থাপন করা হয়ে থাকে তবে একথাও স্বীকার করতে হয়, যে পশুদেরও এমন কিছু ক্ষমতা বর্তমান যা মানুষ সাধারণভাবে আয়ত্ত করতে পারেনি, যেমন কুকুরের ঘ্রাণ শক্তি, কাকের হজম ক্ষমতা, চিতা বাঘের দৌড়ানোর গতি ইত্যাদি। সুতরাং এরকম কোন বিশেষ গুণের কারণে পশুদের থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না, তাদের জীবনের মূল্য মানুষের তুলনায় কম একথাও বলা যায় না। নৈতিক বিচার বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতাকে যদি নৈতিক দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলে মনে করা হয় তবে যে ব্যক্তি কোমায় আছেন বা মানসিক ভারসাম্যহীন কোন ব্যক্তির নৈতিক বিচার বুদ্ধির অভাব তাদের প্রতি সমাজের নৈতিক দায়বদ্ধতাকে কখনোই অস্বীকার করে না। এক্ষেত্রে দেখা যায় যিনি কোমায় আছেন তার শারীরিক এবং মানসিক কর্মক্ষমতা একটি পশুর তুলনায় ক্ষীণ, তৎ সত্ত্বেও সমাজ তাদের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতাকে কখনোই অস্বীকার করতে পারে না। আবার মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের চেয়ে

অনেক পশুই যথেষ্ট দক্ষ, তাদের ক্ষেত্রেও সমাজ নৈতিক দায়বদ্ধতাকে মেনে নেয়। উপরোক্ত উদাহরণ গুলি থেকে একথাই স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে পশুদের জীবনের তুলনায় মানুষের জীবনের মূল্য মানুষের কাছে সর্বদাই বেশি তার একমাত্র কারণ হল সে মানুষ। সেজন্য পশুদের অধিকারকে খর্ব করা দেখা অনুচিত।

চতুর্থত: বিচার-বুদ্ধি থাকা ও অধিকারের মধ্যে যদি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্বীকার করা হয় তবে বিচারবুদ্ধি আছে এমন কারো থেকে কখনোই অধিকারকে কেড়ে নেওয়া যাবে না। অধিকারের প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল বেঁচে থাকার অধিকার। কিন্তু মানুষ সমাজের স্বার্থে আইনের প্রয়োগ করে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার সময় অন্য মানুষের (অপরাধী ব্যক্তি) বেঁচে থাকার অধিকার খর্ব করে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। কিন্তু যে অপরাধী মানুষটির বেঁচে থাকার অধিকার খর্ব করা হলো তার বিচার-বুদ্ধি নিশ্চিতভাবেই আছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় বিচার-বুদ্ধি থাকা ও অধিকার প্রাপ্তির মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নেই। অতএব তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় পশুদের বিচার বুদ্ধি নেই, তবে তার দ্বারাও পশুদের অধিকার প্রাপ্তিকে কখনো অস্বীকার করা যায় না।

আলোচনাসূত্রে একটি নিষ্পত্তিতেই আসা যায়, পশুর সঙ্গে মানুষের আচরণের ঔচিত্য যেহেতু মনুষ্য কর্তৃকই নির্ধারিত হয়, এবং নৈতিকতার বিচার যেহেতু মানুষের দ্বারাই ঘটে থাকে সেহেতু সেই নৈতিকতা যে মনুষ্যকেন্দ্রিক হবে এটি আশ্চর্যের কিছু নয়। বিচার-বুদ্ধি নেই- এই যুক্তি দেখিয়েও পশুহত্যা ও পশুদের উপর মানুষের অত্যাচার কখনই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া পাশ্চাত্যে এমন অনেক দার্শনিকও আছেন যারা পশুদের বিচার বুদ্ধি থাকার সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছেন। তাই নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ব্যতীত সকল পশুর বিচার বুদ্ধি নেই এ-কথা আমরা বলতে পারিনা। হয়তো ভবিষ্যতে কখনো মানুষ এতটা উন্নত হয়ে উঠলো যে সে পশুদের সাথে কথা বলার যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলল এবং তার দ্বারা পশুদের বিচার-বুদ্ধির উপস্থিতি প্রমাণিত হলো। তাই পশুদের বিচার বুদ্ধি নেই- একথা নিশ্চিতভাবে এখনো পর্যন্ত বলা সম্ভব নয় বলে আমার মনে হয়। আবার বিচার বুদ্ধি না থাকলেও পশুদের অধিকার থাকতে পারে বলে আমি পূর্বেই যুক্তি দ্বারা দেখিয়েছি। তাই কেবল মনুষ্যকেন্দ্রিক নৈতিকতার ওপরে নির্ভর করে পশুর অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না।

গ্রন্থপঞ্জী:

1) চক্রবর্তী, সোমনাথ. (১৯৯৮). *নীতিবিদ্যার তত্ত্বকথা.* কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স.
2) বন্দ্যোপাধ্যায়, তীর্থনাথ ও বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্চালী (সম্পা.). (২০১১). *প্রায়োগিক নীতিবিদ্যা.* কলকাতা: এবং মুশায়েরা.
3) Bandyopadhyay, Tirthanath. (2004). Animal Rights: Some Reflections. Journal of Philosophy. Howrah: Department of Philosophy, Bijoy Krishna Girl's College. Vol. II.
4) Descartes, Rene. (2006). A Discourse on the Method. Maclean, Ian (Trans.). New York: Oxford University Press.
5) Kniess, Johannes. (2018). Bentham on animal welfare. British Journal for the History of Philosophy. Vol- 27(3).
6) Russell, Bertrand. (1945). A History of Western Philosophy. New York: Simon and Schuster.